



আমাদের দেশের চালচিত্র

ফারুক হোসাইন খান

=====

রামপুরার রামবাবুরা বড় বড় বেড়ে গেছে। ওদের মাতামাতি দাপাদাপি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একটি মুসলিম দেশের মুসলিম সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে বিটিভি নামক শয়তানের আড্ডাখানাটি মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হানা ও ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করতে আদাজল খেয়ে নেমেছে। সম্প্রতি বিটিভির গুটিকতক রামভক্তের চূড়ান্ত আঙ্কারা পেয়ে জনৈক সুবিধাবাদী ‘ফ্যাসাদ আলীর’ ‘উঠোন’ নামক ধারাবাহিক নাটক প্রচার শুরু হয়েছিলো। এই ফ্যাসাদ আলী দেশের স্বাধীনতার পর যখন যে পার্টি ক্ষমতায় এসেছে তখন সেই পার্টির নেতার পায়ে তেল মালিস করে সেই পার্টির অকৃত্রিম সেবক হতে পারঙ্গম। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে তিনি শরীর থেকে মুজিব কোর্টটি খুলে রেখে ময়দানে ধানের শীষ কুড়াতে নামেন। ধানের শীষ কুড়ানো শেষে আবার সুযোগ বুঝে লাঙ্গল ধরে এরশাদ শাহীকে কাগজে কলমে মহাপুরুষ বানিয়ে ছাড়েন। জনগণের ল্যাং খেয়ে এরশাদ বঙ্গভবন থেকে চারদেয়ালের মধ্যে নিষ্কিপ্ত হলে এই ফ্যাসাদ আলী’ গোলার ধান শেষ হচ্ছে দেখে পুনঃরায় ধানের শীষ কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তোষামোদ আর ঝোপ বুঝে কোপ মারা বিদ্যেতে এই ফ্যাসাদ আলী এত হাত পাকিয়েছে যে, ভবিষ্যতে যদি পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তবে সুযোগ বুঝে পুরোনো মুজিব কোর্টটি গায়ে চাপিয়ে সুরুৎ করে নৌকার ওপর ঝাপিয়ে পড়তে তার মোটেও লজ্জা করবে না। কোন ইসলামী দলও যদি ক্ষমতায় আসে তবে ১০ টাকার একটা টুপি কিনে নিয়ে, কোন আত্মীয় স্বজনকে ধরে কোন ইসলামী দলের একখানা সদস্য সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। এই বহুমুখী চরিত্রের মানুষটি বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারকে খুশী করতে গিয়ে উঠোন নাটকের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে জঘন্য খেলায় মেতেছে। নাটকের সংলাপের মাধ্যমে ইসলামকে একটি অন্যায় ও বিরক্তিকর ধর্ম হিসেবে দেখানো হয়েছে। নামাজে কাতার বন্ধ মুসলমানদের কমিউনিস্ট বলে পরিচিত করতে কসরত করেছে। এই নাটকে একজন টুপি পড়া, দাড়িওয়ালা মুসলমানকে অন্যায়ের প্রতীক ও একজন হিন্দুকে আদর্শের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

নামাজকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করে একে উপহাসের খোরাক বানিয়েছে এই কীর্তিমান (!) নাট্যকার। আর বিটিভির রাম ও বাম মতাদর্শের তকমা আটা কর্তা বাবুরা বেআক্কেলের মত এই নাটকটিকে প্রচার করেছিলো। সচেতন আলেম সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে যেদিন টিভি ভবন ঘেরাও করে সেদিনও রাম বাবুরা জনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এ নাটকটি প্রচার করেছে। ওদের ঔদ্ধত্যের এখানেই শেষ নয়। ওরা মুসলমানদের পবিত্র ঈদ উপলক্ষে প্রচার করে কুরুচিপূর্ণ ছায়াছবি, বিশেষ নাটক ও বাদরামীতে পরিপূর্ণ অনুষ্ঠান। রমজানের পবিত্রতাকে উপহাস করে শো-গার্ল’ সদৃশ্য ললনাদের দ্বারা সংবাদ পাঠ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করানো হয়। মুসলমানদের পয়সায় লালিত পালিত হয়ে আবার সেই মুসলমানদের ঈমান-আকীদা নিয়ে কুকুর শেয়ালের মত টানা হেচড়া করে চলছে ওরা। ওদের সাম্প্রদায়িকতার শিং বেশ লম্বা হয়েছে বলে মনে হয়। আঙ্কারা পেয়ে ওদের হিংস্র দাঁতগুলো ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আর কত? কুকুর পাগল হলে এবং তার প্রতিষেধক না দিয়ে

তাকে জনসমক্ষে ছেড়ে দিলে সে নিরীহ মানুষকে কামড়াবেই। সুতরাং রামপুরার ওনাদেরও প্রতিষেধক দেয়া দরকার, ওনাদের হিংস্র দাঁত ও শিংগুলোকে আরো অনিষ্ট করার পূর্বে উপড়ে ফেলা দরকার। এক্ষুণি ঘাদানী-চুবানী দিয়ে ভূতের আছর থেকে ওদের সুস্থ করা দরকার। কোথায়, কোন বলয়ে লুকিয়ে আছে সার্থক মৌলবাদী মুসলমানরা? তোমাদের ধর্মের মূল উৎখাত করার চক্রান্ত চলছে, তোমরা কি এর প্রতিকার করবে না? নিরব থাকবে আর কত কাল?

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যে মানুষের মধ্যে শিক্ষার কোন আলো নেই তার আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যুগে যুগে মহা মনীষীরা মানুষের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনুরূপ বহু মূল্যবান কথা বলেছেন। তাই আমার মত নাদান বান্দার এ বিষয়ে নতুন কোন আলোচনা করে পণ্ডিতি জাহির করার খায়েস নেই। এতে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে বা ব্যাপারটা লেজে-গোবরে করে ফেলারও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ও পথে না গিয়ে আমি শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে একটা ছোট গল্প বলতে চাই। একদা উপমহাদেশের একজন রাজনীতিকও একদিন এক কটুর মৌলবাদী মোল্লার পাশ্চাত্য পড়ে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে বাধ্য হলেন। ছোট বেলায় মজতবে নামাজ পড়া কিছুটা শিখলেও দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এবং মসজিদে গমন ও ধর্ম পালন থেকে দূরে থাকার ফলে বার বার তার নামাজ পড়ায় বিঘ্ন ঘটছিল। অবশেষে ঝানু ঈমাম সাহেব যখন আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ বলে নামাজ শেষ করলেন, উক্ত নেতা তখন বলে উঠলেন, “ওয়ালাইকুমুস্ সালাম মৌলভী সাব!” উল্লেখ্য, এই নেতা মুসলমানতো বটে একটি মুসলিম দেশের ৫টি বছর প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে রেখেছিলেন এবং পরিশেষে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলে তার মৃত্যু হয়। অবশ্যই এই নেতা জীবনে অনেক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন, অনেক বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তার শিক্ষা জীবনে এমন একটা ফাঁক ছিল যাতে সে ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করার মত যথার্থ বিদ্যেটুকুও অর্জন করার সুযোগ পাননি। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রেও এরূপ ধর্মীয় জ্ঞানহীন নেতা-কর্মী নেহায়েত কম নয়। বলতে গেলে সমাজ ও রাষ্ট্র এই শ্রেণীর মানুষের হাতেই জিম্মি। রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে ধর্মের প্রভাব মুক্ত ধ্যান-ধারণার দ্বারা।

পার্লামেন্ট, সংবাদ পত্র, শিক্ষা ব্যবস্থা, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা সবই এই শ্রেণীর মানুষের কজায়। এরা কিন্তু সকলেই অসংখ্য ডিগ্রীধারী শিক্ষিত মানুষ। অথচ মুসলমানের সন্তান হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে কায়ম করার দায়িত্ব থাকলেও এরা তা সযত্নে পরিহার করে চলে। তাদের এই ব্যর্থতার জন্য কিন্তু তাদের দোষারোপ করে সুবিধা নেই। এই দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের নির্ধারকদের এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্তাব্যক্তিদের ঘাড়ে চাপে। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে মুসলিম শাসনামলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছিল ধর্মীয় এবং বৈষয়িক, উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত। তখন একজন ইঞ্জিনিয়ার বা একজন সেনানায়ক একই সাথে একজন ধার্মিক, নীতিবান ও আলেম হতেন, ফলে সমাজে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করার জন্য সর্ব প্রথম শাসক জাতি মুসলমানদের ধর্মীয় নীতি চেতনা বিলুপ্ত করার চক্রান্তে ধর্মহীন ইংরেজী স্কুল এবং মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। প্রশাসন থেকে সকল মুসলমানকে বিদায় করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে যে সব মুসলমানের সন্তানেরা ইংরেজী স্কুল ও মিশনারী স্কুলে লেখা পড়া করত তাদেরকে প্রশাসনের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ করা হত। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকায় মুসলমানদের এক শ্রেণীর মনে ইংরেজী স্কুলে পড়ার আগ্রহ বেড়ে যায়। মূলত এসব স্কুলে শিক্ষিত মুসলমানদের গোলামী মানসিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা হত।

তাদেরকে শেখানো হত আধুনিক পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার, উন্নতি ঘটেছে, যত সভ্যতা নির্মিত হয়েছে তা সবই ইউরোপের অবদানের ফলে হয়েছে। মুসলমানরা একটা দুর্বল জাতি, তারা পৃথিবীর উন্নতির জন্য কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। কচি বয়স থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের মাথায় এই ধারণা ঢুকিয়ে

দেয়ায় এবং ইসলামী সভ্যতা, ইতিহাস, শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক রাখতে না দেয়ায় উপরোক্ত ধারণাকেই তারা সত্য বলে গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে তারা ইউরোপিয়ান শিক্ষক ও অফিসার বসদের সীমিতরিজ্ঞ শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে গোলামের মত স্যার, স্যার করতে করতে পেরেশান হত। এ অবস্থার জের এখনও অব্যাহত রয়েছে। তবে নেতা ও বসের পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই কিন্তু নীতি ও মানসিকতার পরিবর্তন বিন্দুমাত্র ঘটেনি। কেননা সেই শিক্ষানীতি এখনও এদেশে বর্তমান।

মুসলমানরা ফার্সী ও আরবী ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করত। ইংরেজরা সেখানেও হস্তক্ষেপ করল। আরবী ও ফার্সী ভাষার ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ এবং ভাষাকে অপমানকর পর্যায়ে রাখার জন্য তারা একটা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র আটল। প্রথমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রচলন ঘটায়। অফিস-আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ব্যবহার শুরু হয়। ফলে, প্রশাসন থেকে ফার্সী ভাষা জানা সাধারণ কর্মচারীরা বাদ পড়ে যায়। ইংরেজী শিক্ষা তথা ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়ার গুরুত্ব আরেক দফা বৃদ্ধি যায়। যে সমস্ত সরকারী বা আধা সরকারী স্কুলে ফার্সী, আরবী ও ধর্মীয় শিক্ষক ছিল তাদের বেতন-ভাতা ইংরেজী জানা শিক্ষকদের অপেক্ষা কয়েক গুণ কমিয়ে দেয়া হল। ফলে এককালে যে ধর্মীয় শিক্ষকেরা সমাজের প্রতিপত্তি ও সম্মানের।

পাত্র ছিল; তারা সমাজের দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হয়। ইংরেজী শিক্ষিতরা আর্থিক দিক দিয়ে সরকারী আনুকূল্য পাওয়ায় তাদের ছেলেমেয়েরা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে লালিত পালিত হত এবং তারা উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করার সুযোগ পাওয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যে তারাই সমাজের দণ্ড মুণ্ডের মালিক হয়ে দাঁড়ায়। আরবী, ফার্সী ও ধর্মীয় শিক্ষকদেরকে লোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতে থাকে। ফলে কিছুদিনের মধ্যে ধর্মীয় ও আরবী, ফার্সী ভাষায় শিক্ষিতরা সম্পূর্ণ বেকার একটা শ্রেণীতে পরিণত হয়। প্রশাসনের চৌহদ্দিতে তাদের প্রবেশাধীকার অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বেকারত্বের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং উন্নত জীবনের হাতছানিতে লোকেরা তখন দলে দলে ইংরেজী স্কুলে পড়ানোর জন্য সন্তানদের পাঠাতে থাকে। এই ইংরেজী পড়ুয়া ধর্মীয় শিক্ষা বর্জিত মুসলমানরাই এককালে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য হতে লাগল।

ইংরেজদের সৃষ্ট গোলামী মানসিকতা-শ্রেণীর দখলে চলে গেল শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির চাবিকাঠি। ‘যেমনি নাচাও তেমনি নাচি’ পুতুলের মত তারা নৃত্য করতে লাগল। এখনও সে নাচ চলছে। ইংরেজরা বিদায় হয়েছে অনেক পূর্বে, কিন্তু তাদের চিন্তা-চেতনা এখনও বহন করে চলছে সেই পুতুল শ্রেণীর উত্তর সূরীরা। ইংরেজদের কারণে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য স্টাইলের জড়বাদী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যে একটা দেয়ালের সৃষ্টি হয়েছিল আজও তা অটুট আছে। আজও মুসলমানের সন্তানেরা ইংরেজদের চেতনায় গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিড় করে। ওদের প্রত্যেকের চোখের সামনে উন্নত, ভবিষ্যৎ- একটা সরকারী চাকুরী, একটা সুন্দর বাড়ী ও প্রগতিশীল (!) একটা পরিবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা পাতানোর স্বপ্নের হাতছানি। এদের গাদা গাদা বইয়ের কোথাও লেখা নেই, নিজে সৎ হও, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজের নিষেধ কর। তার পরও ওরা সেসব পড়ে এবং ওরাই প্রশাসনে থেকে ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতায় ডুবে থাকে। স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় ওরা এই ঘুনে ধরা পদ্ধতির পরিবর্তন হোক তা চায় না। ইংরেজদের চেয়েও হীন স্বার্থে ওরাই প্রশাসন থেকে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের দূরে রাখছে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আবার এই ইসলামই অন্যান্য মতাদর্শের মানুষের সমাজে যা ভালো ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচ্য তা গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু ওরা এই দেশ ও জাতির উন্নতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মহীন ও জড়বাদী শিক্ষাব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করে এই দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আর কতদিন আমরা বেনিয়াদের ছড়িয়ে দেয়া সমাজ বিধ্বংসী ভাইরাসে

আক্রান্ত হতে থাকব? কতদিন নিজেরাই নিজেদের একটা উন্নত ভবিষ্যত গড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে রাখব? জাতির উন্নতির অন্তরায় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেয়ার মত কোন বিপ্লবী শিক্ষাবিদ কি এদেশে নেই? একজন শাহ ওয়ালী উল্লাহর বড়ই প্রয়োজন আজ! বাঁদরেরও বাদরামীর সীমা আছে, ওদেরও লাজ-লজ্জার একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু আমাদের দেশের কৈবর্তন বিবিদের কোন লাজ-লজ্জার বালাই নেই। ওরা যেমন খুশি নাচে, যেমন খুশি ভেক্কী খেলে। এই দেশের জংলী নারীবাদী আন্দোলনের হোতাদের কথাই বলছি, একজন তো বুড়ো বয়সে রাম-কৃষ্ণের অন্ধ প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো শুরু করেছেন।

ঢাক, শংখ ও কাসা বাজিয়ে উৎসব করছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও ইন্দিরা পূজার মধ্যে উনি স্বর্গের সুখ খুঁজে পেয়েছেন। নারীবাদী আন্দোলনের ঠালায় নাকি উনি বোরকা ছেড়েছেন। ইদানিং উনি রাম-কৃষ্ণের এত গুণগান শুরু করেছেন যে, আশংকা হয় কবে কোন, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধা বা দ্রৌপদির ন্যায় তিনি বস্ত্র হারা হয়ে অবশেষে জন্মলগ্নের অবোধ শিশুর বেশ ধারণ করে ব্যস্ত রাজপথে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেন। এই 'কৈবর্তন বিবির ন্যায় ভীমরতিতে আক্রান্ত একপাল বুদ্ধিবাজের ইমাম জনৈকা মহিলা মোল্লা আর মৌলবাদ, মৌলবাদ করে দেশজুড়ে একটা মাতামাতি ও খিস্তি খেউর তুলে জিহ্বায় ক্যান্সার বাঁধিয়ে ফেলেছেন। অবশেষে তাকে খালুর দেশ যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হয়েছে দাওয়াই আনতে। এতো গেলো বুড়ো বাঁদরদের কীর্তি। সেদিন ডিম্পল হুইস্কির বোতলের মত চকচকে চেহারার ত্রিশাৰ্ধে বয়সের উলংগ নারীবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা মিসেস 'বাঁদর সুন্দরী' দেখালেন এক ভেক্কী খেলা। সরি, ইনি আবার বৈবাহিক সম্পর্কে আস্থাশীল নন কিনা। তাই 'মিসেস' নয় তিনি গণনারী বিশেষণটাই বেশী পছন্দ করেন। তিনি দুই নম্বরী পাসপোর্ট নিয়ে যাচ্ছিলেন তার ধমনীতে যাদের রক্ত প্রবাহমান সেই মামাবাবুদের দেশে। কিন্তু বেরসিক ইমিগ্রেশন অফিসাররা তার অদৃশ্য লেজটা টেনে ধরে এ যাত্রা মামা বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

একজন সরকারী ডাক্তার হয়ে সাংবাদিকতার নাম ভাঙ্গিয়ে ইনি পূর্বেও বেশ কয়েকবার ইমিগ্রেশনের ফাঁক গলিয়ে মামা বাবুদের দেশে গিয়েছিলেন। যাহোক, এবার কিন্তু তার সাথে তিনজন সঙ্গী ছিল। আগেই বলে রাখা ভালো, উনি এক স্বামীতে তুষ্ট নন, তাই চার চার বার পোষাকের ন্যায় স্বামী বদলিয়েছেন। অবশেষে ছাপার অক্ষরে একত্রে ৪ জন পুরুষ রাখার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। এবার তার যাত্রায় পুরুষ সঙ্গীর সংখ্যা চার থেকে এক কম হলেও মামা বাড়ী যাওয়ার সাথীরা জুটেছিল জব্বরই বলতে হবে— রতনে রতন চিনে কথাটির সার্থক রূপায়ন ঘটেছিল সেদিন। তার অন্যতম বুড়ো সাথী শামসুর রহমান (যিনি ওপারে 'স্যামচুর দদা' নামেই পরিচিত) মনে করেন, পরকিয়া প্রেমে পাপ নেই, পরনারীর নিতম্বের দিকে তাকিয়ে তিনি নাকি সুখ পান। অন্যদিকে আলোচ্য মহিলা নিজেকে পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে পর পুরুষকে প্রদর্শন করে নাকি সুখ সুখ ঠেকেন। তাই একই চিন্তা-চেতনার জুটিটি জমেছে ভালই। কিন্তু তারপরও বয়স নিয়ে একটা কৌতুহল থেকে যায়। সাবাস, এই না হলে ইতিহাস হয়, এই না হলে জমে! জয় হোক তব নারীবাদ (!)

দেশ জুড়ে একটা অশ্লীলতার সয়লাব চলছে। নৈতিকতা ও চরিত্র বিশ্বংসী এ সয়লাব প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ভিতের বারোটা বাজিয়ে ছাড়াচ্ছে। এ সয়লাবের নাম হল 'যাত্রা'। প্রতি বছর প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে গ্রামে-গঞ্জে শহরে শীতের মওসুম শুরু হলেই গরুর পালের মত একপাল পুরুষ-মেয়ে মিলে তথাকথিত লোকজ সংস্কৃতির নামে উদ্যোম নৃত্য আর বেহায়াপনা শুরু করে। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তির একে সংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে এর উদ্বোধন করে আর কীর্তিমান সংস্কৃতিবানরা (?) একে যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালী সংস্কৃতির অঙ্গ বলে নিজেদের অপকর্মের সাফাই গায়। কিন্তু ওনারা বলবেন কি, এই লোকজ সংস্কৃতির সাথে বাংলার মানুষের সংস্কৃতির যোগাযোগ কতদিনের, কবে এর প্রচলন শুরু হয়েছিলো? পারবেন না। কারণ তাতে নিজেদের উত্তরে নিজেরাই অপমানিত হবেন যে! আধুনিক নারীপুরুষের সম্মিলিত অপেরার মাধ্যমে যে যাত্রা পালা আমাদের

দেশে দেখা যায় এর উদ্ভব হয় ইংরেজদের অনুকরণে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে। হিন্দুদের মাধ্যমে বেনিয়ার জাত ইংরেজরা এই উপহাদেশে অপসংস্কৃতির বীজ বপন করার জন্য শুরুতে শহরে শহরে থিয়েটার স্থাপন করে। পাশ্চাত্যের নাটক অভিনয় শুরু করে। এসব নাটকে পাশ্চাত্যের নারী পুরুষেরা অংশ নিত। উল্লেখ্য, ইংরেজ আগমনের পূর্বে মুসলিম শাসনের শেষাংশে গ্রাম্য অঞ্চলে এক প্রকার নাটক অভিনীত হত।

কিন্তু সেসব নাটকে নারী চরিত্রেও পুরুষেরা অভিনয় করত। কিন্তু ইংরেজদের বদৌলতে তৎকালীন সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গনে হিন্দুদের এক চেটিয়া পদচারণার কারণে হিন্দুরা পাশ্চাত্যের থিয়েটারের অনুকরণে অপেরার সৃষ্টি করে। একই সাথে তারা এর মধ্যে নৃত্য ও সংগীতের বিশেষ একটা অংশ জুড়ে দেয়, নারী চরিত্রে নারীরা অভিনয় ও নাচ-গানের সুযোগ পায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, হিন্দু ধর্মচর্চায় নাচ-গান একটা বিশেষ অংশ। তাদের ধর্মমতে পর্দা প্রথার কোন গুরুত্ব নেই বলেই তারা অপেরায় নারীপুরুষের সম্মিলিত নৃত্য-গীতের একটা নব সংস্করণ জুড়ে দেয়। ক্রমশ এই অপেরা সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে রাজ-শক্তি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদে। আজও আমাদের দেশে যে সমস্ত অপেরা দেখা যায় তারা সিংহভাগ কর্মী-কলাকুশলী হিন্দু সম্প্রদায়। কালের ধারায় কিছু সংখ্যক কপাল পোড়া মুসলমানের সন্তানেরা এই অপেরার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু তাই বলে এটা বলা যাবেনা যে, এটা এদেশের মুসলমানদের যুগ, যুগের সংস্কৃতি। কেননা, কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন না যে, এই গুটিকতক মুসলমানের সন্তানেরা কেউই ধর্মের অনুশাসন ঠিকমত পালন করেন বা তারা মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। বরং বলতে হবে যে, ঐ মুসলিম নামধারী লোকগুলি ইংরেজদের প্ররোচনায় হিন্দুদের দ্বারা সৃষ্ট হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে মুসলিম সমাজে একে মুসলিম সংস্কৃতির অংশ বলে চালিয়ে দিতে চায়, এরা বিজাতীয় সংস্কৃতি চর্চা করে এর মধ্যে আত্মতৃপ্তি খুঁজে পায়। আর এর বিষময় ফল ভোগ করতে হয় এদেশের সরল প্রাণ মুসলমানদের। তথাকথিত প্রিন্সেস আর বাঈজীদের নাচ আর গানের মোহে উঠতি বয়সী তরুণেরা পিতার পকেট কাটছে, ধানের গোলা সাবাড় করে দিচ্ছে, পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটছে। যাত্রা গানের ফলে কত পরিবারে পিতা-সন্তান ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। এখানেই শেষ নয়। তরুণ ও যুবক সমাজ এর বদৌলতে চরিত্র হারাচ্ছে, তারা পথে ঘাটে স্কুল ও কলেজগামী মেয়েদের উত্যক্ত করছে, মদ-গাঁজা সেবন কেন্দ্র রমরমা হচ্ছে, বখাটের সংখ্যা বাড়ছে, জুয়ার আসরে সর্বশ্রান্ত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু প্রশাসনের কোন কর্তা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারবেন যে, এ ক্ষতির তুলনায় যাত্রার মাধ্যমে সমাজের কানাকড়িও উপকার হচ্ছে? হচ্ছে না। তার পরও এ মরণ যাত্রা সমাজ বিধ্বংসী এ যাত্রা, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তাদের আঙ্কারায় হরদম চলছে তো। চলছেই। কিন্তু আর নয়, একে থামাতে হবে। এ মরণ ব্যাধিকে সমূলে সমাজদেহ থেকে উৎখাত করতেই হবে। মুসলিম সংস্কৃতির স্বাভাবিক বজায় রাখতে হলে এসব আধুনিক ফেতনার বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক জিহাদ ঘোষণা করতে হবে।

কোথায় সেই টগবগে মুজাহিদ্দীন কাফেলা?

এখনও ঘুমিয়ে থাকবে তোমরা?
